সংবাদ

তারিখ ... 11 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

কারিগরি শিক্ষার মানবৃদ্ধিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিন

জুবায়ের আল মাহ্‌মুদ

লেখার শুরুতে পাঠককে একটু ভাবনায় ফেলে দিই। দেশে প্রতিবছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে যেভাবে পাসের হার বাড়ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আসতে পারে, সেদিন দেশের শত ভাগ মানুষই হয়তো স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করবে। এমন চিত্র দেশের জন্য ভালো কি মন্দ হবে সেই বিতর্কে যাব না, বাস্তবতার আলোকে একথা বলতেই হয়, আসলে দেশের খুব বেশি সংখ্যক মানুষ জ্ঞান আহরণের জন্য পড়াশোনা করে না। বরং অধিকাংশের মূল লক্ষ্য 'চাকরি'।

উপরের ভবিষ্যদ্বাণীটুকু নিশ্চয় এবার সবার মনে শঙ্কা তৈরি করেছে। কারণ আজ হোক আর কাল হোক দেশে শত ভাগ মানুষ শিক্ষিত হবেই। কিন্তু সেদিন কী শতভাগ মানুষকে চাকরি দেয়া সম্ভব হবে? এক কথায় যদি বলি তাহলে বলতেই হবে 'না'। কারণ যেদিন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা শতভাগ হবে, সেদিন নিশ্চয় অফিসের বড় কর্তা থেকে শুরু করে কৃষক, ভ্যান চালক, বাস চালক, পথের চানাচুরওয়ালা এমন কি জুতা সেলাইয়ের কাজটি কোন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারিই করবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার মান বাড়ানো শীর্ষক এই লেখায় এমন পরিসংখ্যান কেন? উত্তর হচ্ছে বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে প্রকৃত অর্থে আমরা যেভাবে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করছি, তাতে সবাই 'দুই দুগুণে চার' হয় এটাই শিখছে। কিন্তু দুই দুগুণে পাঁচও তো হতে পারতো! পাটিগণিতের কোন সূত্রানুযায়ী দুই ও দুই-এর গুণফল 'পাঁচ' না হয়ে 'চার' -এটা শেখার চেষ্টা করছি না। ভয়ংকর বিষয় হলো আমাদের যারা শেখাচ্ছেন সেই শিক্ষকদের মধ্যে বড় একটা অংশই এমন সৃজনশীল ধারণা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করাতে যান না।

এ কারণেই কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দিনদিন বাড়ছে, যা প্রত্যেককে হাতে কলমে শিখিয়ে দেবে। যাতে করে কেউ যদি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর আর যদি বিদ্যালয়ে নাও যায়, তবুও সে যেন কিছু একটা করতে পারে তার নিশ্চয়তা দেবে।

বিপুল জনগোষ্ঠীর এই দেশে মানবসম্পদ তৈরিতে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক। বিদেশ গমনেচ্ছু সাধারণ মানুষের জন্য কারিগরি শিক্ষায় হয়ে ওঠে জীবিকা অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার। উন্নয়নশীল দেশ বিধায় উন্নয়নের সোপান বাইতে দেশের ভেতরেও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য সৃষ্টি হয় কর্মসংস্থানের সুযোগ।

কিন্তু মানহীন কারিগরি শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা কোনভাবেই সৃজনশীল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছে না। আমি এমন অনেক বিদ্যালয় দেখেছি যে বিদ্যালয়গুলোতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ন্যায় বইখাতাতেই শুধু পড়াশোনা হয়, সেখানে ব্যবহারিক ক্লাস পর্যন্ত হয় না। অথচ কারিগরি শিক্ষার প্রধান নিয়ামক ব্যবহারিক শিক্ষা বা হাতে কলমে শিক্ষা। ব্যবহারিক ক্লাস যদি না হয়, তাহলে কারিগরি শিক্ষায় একজন মানুষ কিভাবে দক্ষ হয়ে উঠবে? এমন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা শুধু 'দুই দুগুণে চার' হয় এটাই শিখছে। কিন্তু 'চার' কেন হয় এটা জানতেও পারছে না।

এমন মানহীন শিক্ষাব্যবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে শিক্ষিতরা একদিকে যেমন চাকরি পাবে না, তেমনিই আত্মকর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে পারবে না। এই যেমন ক'বছর আগেও দেখা গেছে, চাকরির ক্ষেত্রে কম্পিউটার সার্টিফিকেটধারীরা সহজেই চাকরি পেয়েছে। কিন্তু এখন কম্পিউটার সার্টিফিকেটের কী আদৌ কোন মূল্য আছে? না কেউ মূল্য দেয়? সবাই জানতে চায় চাকরি প্রার্থীর কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান আছে কি না। সার্টিফিকেট আছে কি না তা কেউই জানতে চায় না। এটাই কারিগরি শিক্ষা।

সম্প্রতি দেশের বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে অযোগ্য ও মানহীন করিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। তথ্য বলছে, দেশে ৪৬৭ বেসরকারি পলিটেকনিকের মধ্যে শুধু ঢাকাতেই আছে ৭০টি, যার অধিকাংশই মানহীন। আর মফস্বলের চিত্র আরো ভয়াবহ।

গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার দ্বিগুণের ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর অংশ হিসাবে সরকারি পলিটেকনিকসমূহে আসন সংখ্যা এরই মধ্যে দ্বিগুণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের ৬৪টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে পলিটেকনিক কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু মানহীন এই শিক্ষা যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে সরকার নিজেদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে তো?

কারিগরি শিক্ষা কেন প্রয়োজন ছোট একটি চিত্র তুলে ধরলে সহজে বোঝা যাবে। জাপানের পর এশিয়ার মধ্যে দ্রুত উন্নতি করেছে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া। এর পেছনে কাজ করেছে তাদের মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা। মালয়েশিয়ায় কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ৪০, সিঙ্গাপুরে ৬৫ অথচ আমাদের দেশের মূল শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ৬১। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে এ শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ১৭ থেকে ৫৮-এর মধ্যে। এসব দেশের মানুষের বার্ষিক আয় সাত হাজার থেকে ৪২ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত। তবে উল্টো চিত্র বাংলাদেশে। সরকারের দাবি এ দেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ১৪ শতাংশ। তবে বাস্তবে তা আরো অনেক কম বলেই বলছে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো।

সরকার কারিগরিতে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু মানের দিকে না তাকিয়ে শুধু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে কার্যকর ফল পাওয়া যাবে কী? মানহীন কারিগরি শিক্ষার কারণেই এখন চাকরির বাজার ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

জানা যায়, দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দীর্ঘদিন ধরে আসনসংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৫২৮টি। কিন্তু কয়েক বছর আগে প্রতিটি পলিটেকনিকেই ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। এরপর দুই শিফটে ভর্তি করা হয় প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষকসংখ্যা বা অবকাঠামো সুবিধা বাড়েনি। এভাবেই চলে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। চলতি শিক্ষাবর্ষে ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ফের আসনসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি দেশের ৬৪টি সরকারি কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে এবং বগুড়া ভোকেশনাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটেও চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। কোনো ধরণের প্রস্তুতি ছাড়াই এই ৬৫ প্রতিষ্ঠানে এই কোর্স চালু করা হয়েছে। ৪৯টি পলিটেকনিকসহ ১১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে ৫৭ হাজার ৩০০ জনকে। এর মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোতে নির্দিষ্ট বিষয় চালুই হয়নি অথচ তাতেও শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকের অভাবে ক্লাস নিতে পারছে না প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। এসব শিক্ষার্থীর কাছে স্বপ্নের মতো থাকছে ব্যবহারিক ক্লাস। ফলে কোর্স শেষে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা সনদ পেলেও বাস্তবে তারা অদক্ষই থেকে যাচ্ছে।

তথ্য বলছে, অস্থায়ী শিক্ষক দিয়ে চলছে দেশের সরকারি ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। শিক্ষকদের দুই হাজার ১০৭টি শূন্য পদের বিপরীতে ২০১৪ সালে স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রকল্পের (স্টেপ) মাধ্যমে এক হাজার ৪৭ জন এবং স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮৭ জন শিক্ষককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। এসব শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ ছিল গত বছরের জুন পর্যন্ত। পরে তাদের মেয়াদ ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অস্থায়ী ভিত্তিতে এসব শিক্ষক নিয়োগ দেয়ায় তাদের কাছ থেকে যথাযথ শিক্ষা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা।

বর্তমানে দেশে সব মিলিয়ে সাত হাজার কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলেও এর বেশিরভাগই বেসরকারি। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই ভুঁইফোড়। অভিযোগ রয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বড় কর্তাদের হাত করে নেওয়া হচ্ছে একের পর এক বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন। অথচ তাদের ক্যাম্পাস, শিক্ষক, লাইব্রেরি বলতে কিছুই নেই। ভাড়া করা বাড়ির দু-একটি কক্ষে আকর্ষণীয় সাইনবোর্ড ঝুলিয়েও চলছে ব্যবসা। টাকা হলেই ভর্তি হওয়া যায়। যথাসময়ে সার্টিফিকেটেরও রয়েছে নিশ্চয়তা। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা দক্ষতার দিক দিয়ে অন্তঃসারশূন্যই থেকে যাচ্ছে।

জানা যায়, সিটি করপোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করলেই পাওয়া যায় অনুমোদন। নীতিমালা আর যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, ঘুষ দিলেই এখানে সব হয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে। এসব প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালাও নেই। বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই গণহারে শিক্ষার্থী ভর্তি করে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সমাজে স্তরে স্তরে উচ্চ শিক্ষিত আলোহীন ব্যক্তিদের দেখা মিলবে হর-হামেশায়। তাই শিক্ষা ও শিক্ষিতের হার বাড়ানোর আগে শিক্ষার মান বাড়ানোর উপর জোর দিতে হবে সবার আগে। তা না হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

[লেখক : সাংবাদিক]
jubaernews24@gmail.com